হতভাগা পিতা কোরবান আলী!

বনি আমিন

অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে নুর আলী (নুরালী) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে তড়িঘড়ি দেশে উড়ে গেলেন। ছুটে গেলেন অসুস্থ অশীতিপর জননীকে একনজর দেখতে। পালিকা মাতা, কারণ তার জঠরধারিণী তাকে এ ধরাধামে পৌঁছে দিয়ে এক মুহুর্ত দেরী করেননি। আতুড় ঘরেই তার একমাত্র স্বাক্ষর নুর আলীকে ছেড়ে তিনি চলে যান। অতঃপর বাবার দ্বিতীয় সংসার। প্রকৃতির চিরন্তন চক্রে নুরালী তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের একাংশ মেহেরপুরের পৈতৃক গ্রামে কাটায়। বিমাতা নয়, মায়ের যত্ন-আত্তিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নুরালী বেড়ে ওঠে। বাবা গ্রাম্য কবিরাজ। টানাপোড়েনের সংসারে বিত্ত ছিলনা বটে তবে সুখের অভাব ছিলনা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বৃত্তি এবং পাশাপাশি বিমাতার ধনাঢ্য ভ্রাতার আন্তরিক সহযোগীতায় নুরালী যথাসময়ে তার স্কুল ও কলেজ পাঠ সমাপ্ত করে। দুর্নীতিতে বিধ্বস্ত, হতদরিদ্র মাতৃভুমির বেকারত্বের ধূধূ মরুতে নিরন্তর হেঁটেও তিনি একখন্ড মরুদ্যানের সন্ধান পাননি। কর্মজীবনের কঠিন বাস্তবতা তাকে একসময় মেহেরপুর থেকে সিঙ্গাপুর চলে যেতে বাধ্য করে। ধীরে ধীরে নুরালী কর্ম ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে তার প্রবাসী জীবনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা অর্জন করেন। সিঙ্গাপুরে এককক্ষে দশজনের মেসে থেকেও নুরালী তার বৃদ্ধ বাবা, মা এবং বৈমাত্রিয় ভাইবোনদের কথা ভোলেননি। আয়, সঞ্চয় ও আর্থিক সচ্ছলতার সাথে অনুপাত করে তিনি সর্বদা তাদের সাহায্য করেছেন। পদ্মার তাজা ইলিশের ঝোল দিয়ে দুমুঠো গরম ভাত খাওয়া বরাবরই তার বাবার পছন্দ ছিল। দোচালা শনের ঘর থেকে চৌচালা টিনের ঘরে বসত করার স্বপ্ন অনেক কাল থেকেই তার মায়ের ছিল। কিন্তু শনের ঘরটিকে এক্কেবারে দালান করে দিয়ে নুরালী তার মা'কে ওয়ান্ডারল্যান্ডের এলিসের মত চমকে দিয়েছিলেন। বিবাহযোগ্যা দুটি বৈমাত্রিয় বোনকে সাড়ম্বরে পাত্রস্থ করেছেন। সময়ের ব্যাবধানে একে একে দু ভাইকে তার কাছে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসেন। বাবা ও মা'য়ের প্রতি দায়ীত্ব ও কর্তব্য পালন করতে একজন সন্তানের যতটুকু করা দরকার নুরালী নিরবে একে একে সব করে আসছেন। সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে কর্মক্ষেত্রে ক্যাথরীন নামের একজন বিদেশীনির সাথে তার পরিচয় এবং পরিচয় থেকে প্রণয়, অতঃপর পরিনয়। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে নব্বুই দশকের মাঝামাঝি নুরালী সপরিবারে সিডনীতে অভিবাসন নিয়ে আসেন। ছোট এক ভাইকে সিঙ্গাপুরে ব্যবসার হাল ধরিয়ে দিয়ে পরবর্তিতে আরেক ভাইকে তিনি সিডনীতে নিয়ে আসেন। ছোট ভাইয়ের সংসার না হওয়া পর্যন্ত তাকে আলাদা করেনি, দীর্ঘ দশ বছর একই বাড়ীতে দু'ভাই বাস করে। চাকুরীর পাশাপাশি ব্যাবসা নুরালীকে সিডনীতে দিয়েছে সচ্ছলতা যার নিদর্শন তার পৈতৃক বাড়ীতে প্রতীয়মান। নুরালীর বাবা মার সুখের অন্তঃ নেই, প্রতি দু বছর অন্তর তারা সিডনীতে বেড়াতে আসেন এবং দু বছর অন্তর নুরালী সপরিবারে দেশে বেড়াতে যান। যার ফলে প্রতি বছরই বাবা-মা'র সাথে তার দেখা হতো। পৈতৃক পরিবারের সাথে এরূপ যোগসুত্রের কারনে 'হাফ-কাষ্ট' হলেও নুরালীর সন্তানরা বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচরনের সাথে বিশদভাবে পরিচিত ও সম্পৃক্ত। স্বার্থক পিতৃত্ব ও তৃপ্ত আত্মায় বছর কয়েক আগে তার পিতা ইহকাল ত্যাগ করেন। বিধবা মা'য়ের প্রতি যেন তার দায়ীত্ব আরো বেড়ে যায়। অনিচ্ছা সত্বেও নুরালীর সহধর্মিনী ক্যাথরীনকে এ সকল আচরণ সহ্য করতে হতো। কিন্তু সময়ের আবর্তে সংসারে ক্যাথীর দাপট ও অধিকার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তার তরফ থেকে দিনে দিনে 'নিষেধাজ্ঞা'র চাপ বাড়তে থাকে। তবুও গোপনে নুরালী তার সাহায্য অবারিত রাখে। যারফলে প্রায়ই তার সংসারে খিটিমিটি লেগেই থাকতো। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও অবদানের কোন প্রতিদান পাবেনা নুরালী তা জানে। কিন্তু আবেগ ও আত্মিক বন্ধনের আনন্দে সর্বদা নিজেকে সুখী অনুভব করতো। নুরালীর মহত্ব ও আত্মত্যাগ তার প্রবাসী ঘনিষ্ঠজনদেরকে মুগ্ধ করে, অনুপ্রানিত করে।

কিছুদিন আগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মা'য়ের হঠাৎ শারীরিক অবনতির কথা শুনে নুরালী দ্রুত দেশে যেতে মন স্থির করেন। নুরালীর এ সিদ্ধান্তে ক্যাথী ঘোর আপত্তি প্রকাশ করে, 'বয়স হয়েছে, আজ হোক কাল হোক মরবেই, তাতে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কী আছে। আর তাছাড়া তুমি গেলেই কি মৃত্যু রুখতে পারবে? তুমি গেলে ব্যবসা দেখবে কে? ঘরে মাছ-মাংস কাটাকুটা ও সপ্তাহের চারদিন কে রান্না করবে?' কোন বাধাই তিনি কানে নেননি। তড়িঘড়ি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে দু'গুন টাকার টিকিটে চব্বিশ ঘন্টারো কম সময়ে দেশে মা'য়ের কাছে উড়ে যান। সন্তানকে শিয়রে দেখে বাকশক্তিহীন মা'য়ের আঁখির দুকুল বেয়ে দুফোটা অশ্রু ঝরে পড়ে। তার উপস্থিতিতে হাতের ঈশারায় তিনি ইশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। সে যাত্রায় মা বেঁচে যান। মায়ের চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্য যা যা দরকার সব ব্যাবস্থা করে দু সপ্তাহ পর নুরালী সিডনীতে ফিরে আসেন। ঘরের দরজায় তালা দেখে তিনি অবাক হন, ছোট ভাইকে ফোন করে জানেন ক্যাথী গতকালই তার জিনিসপত্র ও দু সন্তানকে নিয়ে আলাদা বাসায় উঠেছে। নুরালী আশঙ্কা করতেন কোন একদিন

ক্যাথী এমনটি করবেই, তবে এতো আগে করবে তা সে ভাবেনি। চরিত্রের ছিদ্রাত্মক কোন বৈশিষ্টের কারনে যদি ক্যাথী তাকে ছেড়ে যেত তবে বড় কষ্ট হতো। কিন্তু মা'য়ের বিষয়কে উছিলা করে যখন ছেড়ে গেছে তখন তার কোন দুঃখ নেই। নুরালী মনে করেন, 'বৌ গেলে বৌ পাওয়া যায়, মা গেলে মা পাওয়া যায়না।' নুরালী কোনভাবে আপোষ করেননি ক্যাথীর সাথে। প্রেমহীন ও আবেগহীন যান্ত্রিক শহর এই মহানগরে এমনি এক বিরল দৃষ্টান্ত সম্প্রতি সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের নুরালী। সিডনীতে এমনি হয়ত আরো কিছু নুরালী আছে যাদের খবর কেউ জানেনা।

নিতান্ত দরীদ্র বাংলাদেশী হিন্দু এক শীল পরিবারের দুভাই অতি কষ্টে খেয়ে-না-খেয়ে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়। অতঃপর পদবী বদল করে নব্বুই দশকের গোড়ার দিকে তারা সিডনীতে অভিবাসন নিয়ে আসেন। অসীম সাধনা ও অধ্যাবসায়ের জোরে প্রবাসে শিক্ষকতা এবং কম্পিউটার পেশায় তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রয়াত পিতা ও বিধবা মায়ের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে উক্ত ভাতৃদ্বয় একে একে আরো দু ভাইকে সিডনীতে নিয়ে আসেন। বৃদ্ধা বিধবা মা ও বোনের সন্তানরাও অবশেষে আসেন। সকল ভাই একত্রে তাদের মাকে দেবীতুল্য সেবা করে যাচ্ছেন। বৃদ্ধা মায়ের আশীর্বাদে ঈশ্বর তাদের অনেক দিয়েছেন। পৈত্রিক পরিবারের প্রতি উক্ত শীল ভাতৃদ্বয়ের নিবেদন ও অবদান সিডনীর প্রবাসী সমাজে অনুপ্রেরণার জন্যে আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ। নুরালীর ন্যায় শীল ভাতৃদ্বয় প্রমান করলেন 'সবার উপরে মা।'

নুরালীর মত ১৮৪৯ সনে ঠিক এমনটি করেছিলেন বাঙ্গালীর গর্ব ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মেদিনিপুর জেলার বীর সিংহ গ্রামে মা ভগবতী দেবীর অসুস্থতার কথা শুনে তিনি চাকুরিতে ছুটি চান। ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায় তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ছুটে যান গ্রামের বাড়ীতে। মধ্যরাত খেয়াঘাটে মাঝি এবং নৌকা কিছু ছিলনা। কিন্তু মায়ের প্রতি ভীষণ ভালোবাসা ও মনোবল তাকে হাঁড়ভেদী শীতার্ত রাতেও তখন সাহসী করে তোলে। তিনি তখন সাঁতরে নদী পার হন এবং যথাসময়ে অসুস্থ মা'য়ের শিয়রে উপস্থিত হন। তেমন যোগ্য সন্তান এই কলি যুগে খুব একটা দেখা যায় না। আরেকজন মহর্ষি শেখ ফরিদ (রঃ) যিনি অসুস্থ মায়ের শিয়রে জলপাত্র হাতে নিদ্রাহীন সারারাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অসুস্থ ও শয্যাশায়ী মা সন্ধ্যায় ফরিদকে এক গেলাস জল দিতে বল্লেন। ঘরে তখন পানীয় জল ছিল না, ফরিদ পাশের গাঁয়ে ছুটে যান। জল এনে নীরবে যখন ঘরে ঢোকেন তখন দেখেন মা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ভোরে ঘুম ভাঙলে ফরিদকে জলপাত্র হাতে ঢুলু ঢুলু চোখে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা বিস্মিত হন। জিজ্ঞেস করলে ফরিদ বলেন, 'ঘুম ভাঙলে তোমার কষ্ট হবে তাই তোমাকে জাগাইনি, যখন ঘুম ভাঙবে তখন যদি আমাকে ডেকে না পাও সে জন্যেই জল হাতে তোমার শিয়রে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিলাম।' পুত্রের এহেন দায়ীত্ব ও মমত্ববোধ দেখে অসুস্থ বিধবা মা মুগ্ধ হন, প্রানভরে তাকে আশিবার্দ করেন। চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহর রেলষ্টেশনের সাথেই শেখ ফরিদের মাজার। তার মাতৃভক্তির এই কাহিনীটি এখনো লোকমুখে বহুল প্রচারিত।

কথিত আছে দরীদ্র দেশ থেকে আগত একজন ব্যক্তি উন্নত বিশ্বে তার উপার্জন দিয়ে দেশে তার দরিদ্র পরিবারের দশজনকে অন্তত দৈনিক একবেলা খাওয়াতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দরীদ্র দেশের জাতীয় রাজস্বের সিংহভাগ আসে তাদের প্রবাসী নাগরিকদের পাঠানো উপার্জন থেকে। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দেশ কিংডম অব টোঙ্গা (টোঙ্গা) যাদের বার্ষিক বাজেটের নব্বুই শতাংশ আসে 'ফরেন রেমিটেন্স' থেকে এবং বাকী দশ শতাংশ আসে কুমড়া, কাসাবা ও সামুদ্রিক মৎস বিক্রি করে। ২০০০ সনের আগষ্ট মাসে উক্ত প্রতিবেদকের সাথে টোঙ্গা রাজ্যের রাজধানী নুকু আলুফার একটি চার তারকা রেস্তোরায় টোঙ্গার বর্তমান রাজা (তখনকার ক্রাউন প্রিন্স) মহামান্য সিয়াওছি টুপো ৫ম এর সাথে দেখা ও সংক্ষিপ্ত আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য হয়। আলাপের কোন এক পর্যায়ে তাদের রাজস্ব আয়ের মুল উৎস জানতে চাইলে খাওয়া মুখে সহাস্যে তিনি বলে ওঠেন, 'আমাদের প্রবাসী সন্তানরাই আমাদের ভরসা, ওদের পাঠানো অর্থেই আমরা বেঁচে আছি'। ভাবতে অবাক লাগে সিকি মিলিয়ন জনসংখ্যার একটি জাতি ষোল আনাই নির্ভর করে আছে তাদের প্রবাসী সন্তানদের উপর। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মস্তিষ্কে উক্ত শিক্ষাটি যদি থাকতো তাহলে দরীদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত অনেক পরিবার দেশে অভাব অনটনে কষ্ট পেতো না।

সিডনীতে এমন অনেক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী আছেন যারা আয়েশ করে, দাওয়াত খেয়ে দিব্যি আছেন। বাড়ীর পর বাড়ী কিনে বেশ নাম কুড়োচ্ছেন। কিন্তু তাদেরকে এ গন্তব্যব্দি পৌঁছাতে যারা মাথার ঘাম ঝরিয়েছেন, আধপেটা খেয়ে যারা তাদেরকে 'সার্টিফিকেটধারী' মানুষ করেছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় এসে তাদের অনেকেই ঘুনাক্ষরেও ফেলে আসা হতভাগা সেই লোকগুলোর কথা মনে করেন না। বছরান্তে দুই ঈদে কিছু ফীত্‌রা ও যাকাত এবং পুজোতে দান-দক্ষিনার কিছু টাকা পাঠিয়ে অনেকেই দায়ীত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। সিডনীতে তাদের হাবভাব দেখেই মনে হয় নবাব বংশ অথবা বনেদী কোন পরিবার থেকে তারা এসেছেন। ডক্টোরেটধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মাঝে মাঝে কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের মত 'এ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তির সংবাদ তার যৌবনকালের 'পাত্রি চাই' ধরনের পাসপোর্ট সাইজ ফটো

সহ বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ছাপিয়ে থাকেন। বিশেষ সুত্রে জানা যায় যে তার একমাত্র ছোটভাই দুটি সন্তান রেখে অতি অল্প বয়সে মারা যান। অপ্রাপ্ত বয়সে বিধবা ভাতৃবধুটি এঘাট-ওঘাট করে মানবেতরভাবে তার দুটি ছেলেকে মানুষ করেছেন। উক্ত 'এ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত শিক্ষকটি তার অনাথ ভাতৃষ্পুত্রদের দিকে ঘুনাক্ষরেও কোনদিন তাকাননি। খোঁজ নেননি অকাল বৈধব্য বরণকারী তার প্রয়াত ভাইয়ের স্ত্রী কি পেশায় সংসার চালিয়েছেন। সিডনীর একজন সচ্ছল ব্যক্তির বৃদ্ধ পিতা ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও হাইকোর্টের মাজারে লুঙ্গি ও ছেঁড়া জুব্বা পরে প্রায়ই ভিক্ষা করেন। কোন ব্যক্তি অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন শুনলে ছুটে যান, জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদেন। জিজ্ঞেস করেন তার প্রানের বাছাধনটি সিডনীতে কেমন আছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে এ বৃদ্ধ পিতার কষ্ট দেখে কেউ অশ্রু সম্বরণ করতে পারবেনা। মেলবর্নবাসী একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের একমাত্র ছোটভাইটি পিতা/মাতার খরচে অষ্ট্রেলিয়াতে পড়তে এসেছিল। কিন্তু ভীনদেশে অবতরনের তিনদিনের মাথায় ভাইকে তিনি মেসে তুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কারন জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'বেশী ভাত খায়, বিশ্বমন্দার কারনে এখন চালের দাম বেশ চড়া।' আরেকজন হিসাবরক্ষক যিনি অজোগাঁয়ের নিতান্তই হত-দরীদ্র একটি পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। করাত-মিস্ত্রি দরিদ্র পিতা সহায় সম্বল সকল বিক্রি করে তাকে 'সার্টিফিকেট' পেতে সাহায্য করেছিলেন একটু সুখের মুখ দেখবেন বলে। তিনি সিডনীতে দু-একটি বাড়ীর মালিক। ধোপ দুরস্ত হয়ে সস্ত্রিক বিভিন্ন দাওয়াত পার্টিতে মাথা উঁচু করে সামিল হন। সাম্প্রতিক একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার আগ পর্যন্তও তিনি কয়েকটি ইসলামিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। সাংগঠনিকভাবে প্রতি বছর যে যাকাত ও ফীতরা সংগ্রহ করা হতো তা থেকে প্রাপ্ত তার অংশটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তিনি বিধবা মায়ের জন্যে দেশে পাঠাতেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এভাবেই তার মায়ের দুধের ঋণ পরিশোধ করে আসছিলেন। দীর্ঘ দেড় যুগেও মা'কে প্রবাসে নিজের বাড়ী ও সংসার দেখাতে আনছেনা কেন জানতে চাইলে বলে, 'কিভাবে আনবো, আমার মা ঢাকাতেই কখনো আসেননি, তিনি লঞ্চের আওয়াজ শুনলেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন আর হাওয়াই জাহাজের আওয়াজে তিনিতো নির্ঘাত মারা যাবেন।' উক্ত হিসাবরক্ষক একজন স্ত্রৈন হিসেবে করজোড়ে স্ত্রী প্রদত্ত সকল হুকুম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে যাচ্ছেন। আরেকজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার তিনদশক ধরে সিডনীতে থাকেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর আগে তিনি তার বৃদ্ধা বিধবা মাকে এনে 'সরকারী ভাতা-নির্ভর' তার একমাত্র অনুজের কাঁধে তুলে দেন। প্রাসাদোপম নিজের বাড়ীতে মাকে রাখতে পারেননি। অকাল-বিধবা মায়ের কাছে উক্ত ডাক্তার ছিলেন আশার প্রদীপ, সাতরাজার ধন সম অমূল্য রতন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি গাঁটের পয়সা খরচা করে তার মাকে এক বড়ি ঔষধ কিনে দিতে পারেননি। তবে ডাক্তার হিসেবে মেডিকেল রেপঃ থেকে যত ঔষধের স্যাম্পল পেয়েছেন তা অকাতরে তিনি মা'কে একে একে খাইয়েছেন। প্রতি তিনমাস অন্তর তিনি সপরিবারে বিশ্বভ্রমনে বের হন। এটা তার নেশা, কোন বাংলাদেশীকে এমন ব্যায়বহুল নেশায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়না। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার জঠরধারীনিকে প্লেনে উড়িয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কোন শহরে বেড়াতে নিয়েছেন শোনা যায়নি। অনেকটা ফার্মের মুরগীর মত বৃদ্ধার খাঁচাবন্দি প্রবাস জীবন। তবে গত কয়েক বছর আগে শয্যাশায়ী অসুস্থ শশুরকে 'বিশেষ প্রকৃতির স্নান' দেয়ার জন্যে বছর খানেক ধরে তিনি ও তার স্ত্রী প্রতি পনের দিন অন্তর পালাক্রমে সিডনী থেকে পার্থ উড়ে গিয়েছিলেন। নিষ্ঠার সাথে শয্যাশায়ী শ্বশুরের বিষ্টা তিনি পরিষ্কার করেছিলেন। সিডনীতে বৃদ্ধা মা'কে এনে 'ডোল'এর দরোজা চিনিয়ে দিয়েই তিনি তার দুধের ঋন পরিশোধ করেছেন। সুযোগ্য পুত্র বটে। তার চেয়েও কঠিন হৃদয়ের সন্তান আছে এ সিডনীতে যাদের নাম মনে আসলে শরীরের পশম নিঃশব্দে ঝরে পড়ে। এমনি একজন পুত্র বাবর আলী।

কোরবান আলী, আদি নিবাস কুমারখালী, কর্মসুত্রে বসত পটুয়াখালী। দুপুত্র সন্তানের জনক কোরবান আলী একজন সাধারণ করণীক। বিনয়ী ও ধর্মভীরু কোরবান আলীকে এলাকার সকলে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। পুত্রসম ব্যক্তিদের কাছে তিনি 'কোরবান চাচা' নামে সমধিক পরিচিত। চাকুরীর বেতন ও অবসর সময়ের টিউশনের টাকা দিয়ে অতি কষ্টে সপরিবারে দিনাতিপাত করতেন। রিক্সার খরচ বাঁচাতে চাকুরীর শেষদিন অবধি তিনি বাইসাইকেলে চেপে আপিসে যেতেন। বাড়তি খরচ বাঁচাতে সর্বদা বাড়ী থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে দুপুরের খাওয়া নিয়ে যেতেন। টানাপোড়েনের সংসারের কর্ণধার কোরবান আলীর বড় সন্তান বাবর আলী। উচ্চ মাধ্যমিক পাস দিয়ে বাবর 'উচ্চ শিক্ষার্থে' বিদেশ গমনের সখ চাপলো। ছেলের আবদার শুনে কোরবান আলীর মাথায় বজ্রাঘাত। কোথায় পাবে এতো টাকা। প্রানাধিক পুত্রের আবদার রাখতে শেষাব্দি অর্থনৈতিকভাবে তিনি কোরবান হলেন। পুরো পরিবারকে 'হাঙ্গরী' রেখে অতঃপর তিনি ছেলেকে 'হাঙ্গেরী' পাঠালেন। সেখানে বাবর আলী উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি সে দেশের একজন 'মাঙ্গেরী' জুটিয়ে নিলেন। বছর কয়েক সহ অবস্থান অতঃপর শাদীয়ে মোবারক। কুল, মান, ধর্ম সব খুইয়েছে শুনেও স্নেহান্ধ পিতা কোরবান আলী বাধ সাধেননি। উচ্চশিক্ষা শেষে হাতে সার্টিফিকেট এবং কোলে একটি সন্তান নিয়ে বাবর সস্ত্রিক দেশে ফিরে। বছর কয়েক দেশে চাকুরী করে বাবর অষ্ট্রেলিয়াতে অভিবাসন নিয়ে নোঙর ফেলে। তারপর থেকে পিতামাতার

আর তেমন কোন খোঁজ নেয়নি। এমনকি একমাত্র ছোটভাই দবীর আলীকেও কখনো কোনভাবে সাহায্য করেনি। স্বার্থপর ও 'নিষ্ঠুর-কঞ্জুস' বাবর সঞ্চিক দুহাতে উপার্জন করে সিডনীতে সুখ খরিদ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। স্ত্রীর দ্বিতীয় গর্ভের সময় তার একজন বিশ্বস্ত বুয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতঃপর বুয়া হিসেবে তার মা ও বুয়ার দোসর হিসেবে বাবাকেও একবার সিডনীতে আনে। কোরবান আলী তাতেই সুখী, মনে মনে ভাবে, 'তবুওতো মনে রেখেছে'। ছেলের মাথায় ডান হাত বুলিয়ে মনে মনে বলতেন, 'আল্লাহ তুমি আমার বাছাধনকে হেফাজতে রেখ'। বাবর আলীর কানে তার পিতার সেই আশীবার্নী কখনো পৌঁছেনি। যার কারনে দেশে ফিরে যাওয়ার পর দীর্ঘ দশ বছর আর্থিক কষ্টে ক্লিষ্ট পিতামাতার খবর বাবর রাখেনি। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাবর একনিষ্ঠভাবে তার গৃহপালিত শাশুড়ীর যত্ন-আত্তি করে গেছে এবং প্রয়াত শাশুড়ীর ছবি দেয়ালে সেঁটে ধুপ-ধুঁনো দিয়ে দিব্যি পুজো-অর্চনা করছে। বাবরের অষ্ট্রেলিয়াবাসী দু/একজন বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিরা যখন পটুয়াখালীতে যেত তখন বৃদ্ধ কোরবান আলী হন্যে হয়ে ছুটে আসতেন। জানতে চাইতেন তার আদরের পুত্র ও নাতি-নাতনীর খবর। স্বল্পভাষী মা পুত্রশোকে মুহ্যমান, শুধু নীরবে অশ্রু ঝরাতেন। 'জন্ম থেকেই জ্বলছি' নিয়তীর ফোকরে পড়ে কোরবান আলী সারাজীবন শুধু কষ্টই করে গেলেন। পুত্রের আর্থিক সচ্ছলতার প্রভাব তার চৌকাঠে বিন্দুমাত্র পড়েনি। তবুও ছেলেকে এবং তার পরিবারকে এক নজর দেখার জন্যে কী আকুলি ছিল তিনি। অবসর পেলেই মসজিদে ছুটে যেতেন, দুহাত তুলে ছেলের সুমতীর জন্যে দেয়ালে মাথা ঠুকতেন। ঠিক এমনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি একদিন মসজিদের মেঝে পড়ে যান। জ্ঞান হারানোর আগে কাঁপা কাঁপা ঠোঁঠে শুধু বললেন, 'তোমরা আমার বাবরকে এনে দাও, আমার বাছাধনকে আমি এক পলক দেখতে চাই।' হাসপাতালে ভর্তির সাথে সাথে ছোট ভাই দবীর দুঃসংবাদটি বাবরকে দেয়। অসহায় বাবর স্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষায় করজোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু সংসার থেকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়নি। অর্থনৈতিক দৈনতার জন্যে কোরবান আলীকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে কোন বেসরকারী ক্লিনিকে নেয়া সম্ভব হয়নি। যারফলে সরকারী হাসপাতালই ছিল একমাত্র ভরসা। ধীরে ধীরে কোরবান আলীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তবে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর কয়েক ঘন্টার জন্যে তিনি জ্ঞান ফিরে পান। সজল নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল করে তখন সবার মাঝে খুঁজছিলেন তিনি তার প্রথম সন্তান বাবর আলীকে। পুনরায় হুঁশ হারানোর আগে তিনি স্পষ্ঠ কণ্ঠে ওয়াছিয়ত করে যান, 'আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার বাবর না আসা পর্যন্ত তোমরা আমাকে কবর দিও না।' কোরবান আলী চিরতরের জন্যে চোখ মুদলেন। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে বাবর আলী তখন সাহসী হয়ে ওঠে। অবস্থা নিয়ন্ত্রনহীন দেখে চতুরা স্ত্রী ঝটপট তার সাংসারিক ছুটি মঞ্জুর করে। কাকতালীয়ভাবে ঠিক সেই সময়টি বাবর আলীর কন্যার চাকুরীতে ছুটি চলছিল। পিতা বাবরের মনের অবস্থায় কন্যা ভ্রুক্ষেপও করেনি। অভাগা 'গ্রান্ড পা'র 'ফিউনারেল' এ যোগদান করার কোন অভিপ্রায় তার ছিলনা। করবেই বা কেন, পিতা বাবর আলীর শিক্ষায় দিক্ষীত কন্যা তার দাদার মৃত্যুর পরদিন 'প্রাকবিবাহ মধুচন্দ্রিমা' যাপন করতে বালক বন্ধুর সাথে আমেরীকার পথে উড়াল দেয়।

বাবর আসবে তবেই শেষকৃত্য হবে, কবর খোঁড়া হবে। সে পরিকল্পনায় কোরবান আলীর লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। মফস্বলের সরকারী হাসপাতালের মর্গ, লাশের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। চারিদিকে লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চুরির হিড়ীক। এর সাথে জড়িত আছে হাসপাতালের একশ্রেনীর অসাধু কর্মচারী ও ডোম। তাই বাবর আসাব্দি তার ছোট ভাই পাড়ার কয়েকজন যুবক সহ পালা করে রাত জেগে মর্গে লাশ পাহারা দিত। কিন্তু কোন কিছুতেই চোর ঠেকানো যায়নি। তিনদিন পর বাবর পটুয়াখালীতে পৌঁছালে মর্গ থেকে কোরবান আলীর লাশ বের করা হয়। কিন্তু তার বুকের মানিক বাবর আলীর মাথায় যে হাত তিনি রেখে সর্বদা আশির্বাদ করতেন সে হাতটি তার খোয়া গেছে। কারা যেন লাশের ডান হাতটি কেটে নিয়ে গেছে। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়, কিন্তু সমাধান কিছুই হয়নি। ভুল করে চোর 'হার্ট' খুলে নিতে এসে হাত খুলে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নিঁখোজ হওয়া অঙ্গটি ছাড়াই কোরবান আলীকে কবরস্থ করা হয়। শোকাহত বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন সকলের মাঝে গুঞ্জন, 'বাবর আলীর জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়েই শেষাব্দি এ দুর্ঘটনাটি ঘটলো।' কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'যে হাতে তিনি স্নেহাস্পদ বাবরকে কলম ধরিয়েছিলেন, যে হাতে তিনি তাকে মুখে খাওয়া তুলে দিয়েছিলেন, যে হাতে তিনি সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ করতেন, সেই হাতটিই তার খোয়া গেল!!' কেউ কেউ রাগত স্বরে বল্লেন 'যে হাতে তিনি তার পাপিষ্ঠ ও নরাধম পুত্রের জন্যে এত করলেন শাস্তি স্বরূপ সেই হাতটিই ইশ্বর নিয়ে গেলেন।' নানাজনের নানা কথাতে বাবরের কিচ্ছু যায় আসেনা। কারণ তার আতঙ্কিত মন তখনো পড়েছিল সিডনীতে, কখোন তার সাংসারিক ছুটি 'শর্টকাট' হয়ে সিডনীতে ফেরত যাওয়ার তলব আসে। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান শেষে বাবর আলী সেই যে ফিরে এলো, আর কখনো বিধবা বৃদ্ধা মায়ের খোঁজ নিলো না। স্বল্প আয়ের ছোট ভাই দবীর আলী কোনভাবে আজো তার মায়ের দায়ীত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর বাবর আলী প্রবাসে দিব্যি মজায় আছে। যেকোন মেলা, খেলা অথবা অনুষ্ঠানে নিরীহ ও গোবেচারা রূপী নাদুস-নুদুস চেহারার বাবর

আলী গলায় একটি ডিজিটাল ক্যামেরা ঝুলিয়ে দৌড়ে হাজির হয়ে যায়। ছবি তুলতে হবে, ওয়েব সাইটে ছাপাতে হবে। নিজ ঘরে শ্বাশত বাংলার সুস্বাদু খাওয়া রান্না হয়না, তাই পিতৃসেবা নয় বরং একটি ওয়েবসাইট চালিয়ে ছুটির দিনগুলোতে বাবর দাওয়াত খাওয়ায় সর্বদা ব্যস্ত। ছবি তুলতে ক্যামেরার শাটারে বাবর আলী যতবারই চাপ দেয় শাটারের শব্দে ততবারই যেন মনে হয় পিতার কফিনে সে পদাঘাত করছে আর কফিনের ভেতর থেকে হতভাগা কোরবান আলী আর্তনাদ করে বলছে, 'বাবা থাম, আর মারিসনে, বড্ড কষ্ট হয়। যে হাতে তুই ছবি তুলে ঘুরে ঘুরে দাওয়াত খাচ্ছিস, মৃত্যুর আগে আমারো সেরকম একটি হাত ছিল। আমি সে হাতটি তোর জন্যেই পৃথিবীতে রেখে গেলাম। আমার হাতের অমর্যাদা করিসনা বাপ্। পারলে ঐ হাতে তোর অভাগী মাকে একটু সাহায্য করিস।' বোধশক্তিহীন অবিবেচক বাবর থামে না, নিরন্তর এখনো ক্যামেরার শাটার টিপেই যাচ্ছে। সিডনীতে এরূপ বাবর আলীর অভাব নেই। সময়কালে বাবর আলীরা তাদের সন্তানদের কাছ থেকেও একই আচরণ ফেরত পাবে যে কষ্ট ভুগে গেছেন হতভাগা কোরবান আলী। [বাবর আলীর হতভাগা পিতা'র সুরে করুন একটি গান শুনুন, টোকা মারুন]

বনি আমিন, ১৪ জানুয়ারী ২০১০

পাঠকের পাঠানো ইমেইল ও প্রতিক্রিয়া পড়তে এখানে টোকা মারুন